৫। লিপ্যন্তর করুন ঃ

ক) সূর্য পূর্বদিকে ওঠে

খ) রাস্তায় জল জমেছে

গ) মোরা বাংলা দেশের থেকে এলাম

ঘ) একটি মোরগের কাহিনী

ঙ) বন্ধু, কী খবর বলো।

৪.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১। পরেশচন্দ্র মজুমদার, ১৩৮৩ বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম খণ্ড) সারস্বত লাইব্রেরি, কোলকাতা।

২। পার্বতী চরণ ভট্টাচার্য, ১৯৬৬ বাঙলা ভাষা জিজ্ঞাসা, কোলকাতা।

৩। মহম্মদ আব্দুল হাই, ১৯৬৫ ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাঙলা ধ্বনিতত্ত্ব, বাঙলা একাডেমি, ঢাকা।

৪। রামেশ্বর শ, ১৯৮৮ সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, পুস্তক বিপণী, কোলকাতা।

৫। সুকুমার সেন, ১৯৬৮ ভাষার ইতিবৃত্ত ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কোলকাতা।

৬। Bhatacharya, Krishna, 1983, Bengali Phonetic Reader, CIIL, Mysore.

৭। Chatterji, S. K. 1928. A Bengali Phonetic Reader. University of London Press (also from Rupa, Kolkata).

৪.৯ অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত বাংলা ধ্বনিগুলির পাশে বন্ধনীর মধ্যে সংকেতগুলি লিখুন উত্তরের নমুনা হিসাবে প্রথমটি করে দেওয়া আছে।

ক) ঘোষ মহাপ্রাণ ওষ্ঠ্য স্পর্শ ধ্বনি [bh]

খ) উচ্চ-মধ্য সম্মুখ স্বরধ্বনি [ ]

গ) বিবৃত কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি [ ]

ঘ) সংবৃত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি [ ]

ঙ) কণ্ঠ্য নাসিক্য ধ্বনি [ ]

চ) দন্তমূলীয় কম্পিত ধ্বনি [ ]

২। ক) ধ্বনিবিজ্ঞান কী ? ধ্বনিবিজ্ঞানের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ আলোচনা করুন।

খ) বাগ্‌যন্ত্র কী ? বাগ্‌যন্ত্রে মুখ্য ও গৌণ কাজ বলতে কী বোঝেন তা আলোচনা করুন।

গ) বাংলা ধ্বনির উদাহরণ সহযোগে ঘোষ ও অঘোষ ধ্বনির পার্থক্য নির্ণয় করুন।

ঘ) উচ্চারক কী ? নিম্নস্থ উচ্চারকের পরিচয় দিন।

ঙ) বর্ণ ও ধ্বনির পার্থক্য নির্ণয় করুন।

চ) বাংলা স্বরধ্বনি উচ্চারণে জিভের ভূমিকা কী ? উদাহরণ সহাযোগে আলোচনা করুন।

৩। ক) ধ্বনি উচ্চারণে স্বরতন্ত্রীর ভূমিকা আলোচনা করুন।

খ) বাংলায় মৌখিক, নাসিক্য ও অনুনাসিক ধ্বনির উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করুন।

গ) বাংলায় স্বরধ্বনি শ্রেণিকরণের মাপকাঠিগুলি আলোচনা করুন।

ঘ) উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করুন—উপযুক্ত উদাহরণ সহযোগে।

ঙ) বাংলায় স্বরধ্বনি কটি ? স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ করুন।

চ) বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিবিভাগ করুন।

ছ) উদাহরণসহ বিভিন্ন প্রকার ধ্বনি পরিবর্তন আলোচনা করুন।

৪। ক) ধ্বনির উচ্চারণে চারটি প্রধান দিক নিয়ে, উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করুন।

খ) বাংলা ধ্বনি উচ্চারণে বিভিন্ন উচ্চারকের ভূমিকা আলোচনা করুন।

গ) বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনি শ্রেণিকরণের মাপকাঠিগুলি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) বিভাজ্য ও অবিভাজ্য ধ্বনির পার্থক্য নির্দেশ করুন। বাংলা অবিভাজ্য ধ্বনি নিয়ে আলোচনা করুন।

ঙ) ধ্বনিবিজ্ঞানের আলোকে বাংলা মুখের ভাষা ও লেখার ভাষার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করুন।

রাম। কাল রাত্তিরে আমি একটা চমৎকার স্বপ্ন দেখেছি। দেখলুম কি, রাবণ ব্যাটা একটা লম্বা তালগাছে চড়ছে। চড়তে চড়তে হঠাৎ পা পিছলে একেবারে—পপাত চ, মমার চ!

জাম্বুবান। তবে হয়তো রাবণ ব্যাটা সত্যি সত্যিই মরেছে রাজস্বপ্ন মিথ্যা হয় না।

সকলে। হয় না, তবে না—হতে পারে না।

রাম। আমি হনুমানকে বললুম, 'যা ব্যাটাকে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে আয়।' হনুমান এসে বললে কি, ফেলবারও দরকার হল না—সে এক্কেবারে মরে গেছে।'

সকলে। বাঃ বাঃ—একদম মরে গেছে। — ব্যাস। আর চাই কি, খুব ফুর্তি কর!

[বাইরে গোলমাল]

ঐ দেখ্ রাবণের রথ দেখা যাচ্ছে—দেখেছিস? ঐটা রাবণ, ঐ যে লাঠি কাঁধে—

সকলে সে কি! রাবণ ব্যাটা তবু মরেনি—ব্যাটার জান্ তো খুব কড়া।

জাম্বুবান। এই হনুমান ব্যাটাই তো মাটি করলে—তখন রাবণকে সমুদ্রে ফেলে দিলেই গোল চুকে যেত—না, ব্যাটা আবার বিদ্যে জাহির করতে গিয়েছে—'এক্কেবারে মরে গেছে'—

বিভীষণ। চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে—

লক্ষ্মণের শক্তিশেল/সুকুমার রায়

৪.৮ সারাংশ

ক) উচ্চারণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলায় প্রতিটি ধ্বনির উচ্চারণের ৪টি জরুরি বিষয় হল ঃ

১) ফুসফুসের বহির্গামী বাতাস

২) ধ্বনিটি ঘোষ না অঘোষ

৩) ধ্বনিটি মৌখিক না নাসিক্য না অনুনাসিক

৪) ধ্বনিটি ব্যঞ্জন হলে তার উচ্চারণ স্থান, উচ্চারণ প্রকৃতি ও মহাপ্রাণতা

ধ্বনিটি স্বর হলে তা জিভের কোন অংশের কোন উচ্চতায় ও কেমন আকৃতিতে উচ্চারিত হয়।

খ) বাংলায় ৩১টি ব্যঞ্জনধ্বনি, ৭টি মৌখিক স্বরধ্বনি, ১টি অনুনাসিক ধ্বনি—মোট ৩৯টি বিভাজ্য ধ্বনি।

গ) বিভাজ্য ধ্বনিগুলির বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তনও হয়।

ঘ) এছাড়াও সুরাঘাত, শ্বাসাঘাত, যতির মতো অবিভাজ্য ধ্বনিও আছে।

ঙ) IPA সংকেতের সাহায্যে বাংলার নিজস্ব উচ্চারণ লিপিবদ্ধ করা যায়। এই প্রক্রিয়াকে লিপ্যন্তর বলে।

robi thakur! indrojal chilo o name makhano amar ballokal theke. Karon bolchi. amar bɔẽs jɔkhon at Kimba nɔẽ – patsalaẽ pori। tɔkhon amader hedmastar gɔgoncɔndro pal ækdin ækkhana SiSuptto boi theke ekti Kobita abraitti Korlen. Kobitatir dhoni o chɔndo kane jetei mɔntromuggher moto gɔgon cɔndro paler mukher dike eẽe theke SeS Porjonto Sunlam. Kobitar nam bɔyge SɔrOt – lekhɔker nam robindronath thakur.

bibhuti bhuSɔn bɔndopaddhaẽ/

রবি ঠাকুর ! ইন্দ্রজাল ছিল ও নামে মাখানো আমার বাল্যকাল থেকে। কারণ বলছি। আমার বয়েস যখন আট কিংবা নয়—পাঠশালায় পড়ি। তখন আমাদের হেডমাস্টার গগনচন্দ্র পাল একদিন একখানা শিশুপাঠ্য বই থেকে একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন। কবিতাটির ধ্বনি ও ছন্দ কানে যেতেই মন্ত্রমুগ্ধের মতো গগনচন্দ্র পালের মুখের দিকে চেয়ে থেকে শেষপর্যন্ত শুনলাম। কবিতার নাম বঙ্গে শহৎ—লেখকের নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

২) ram : kal rattire ami ækta cɔmotkar SɔpnO dekhechi. dekhlum ki, rabon bæta ækta lɔmba talgache coreche corte corte hɔthat pa pichle ækebare – pɔpato cɔ, mɔmanr cɔ!

jambuban : tɔbe hɔẽto rabon bæta Sotti Sottii moreche – raj SɔpnO mittha hɔẽna

SɔkOle : hɔẽna, hɔbena – hote pare na.

ram : ami honumanke bollum; ja. bætake Somuddre phele diẽ aẽ; honuman eSeæ bolle Ki, 'phælbaro dɔrKar holona – Sæ KKebare more gæche?

SɔKOle : bah bah! ækdɔm more gæche–bæS. ar cai Ki, Khub phurti kɔro!

[baire golmal]

oi dæKh raboner rɔth dæKha jacche deKhechiS? oita rabon, oi je lathi kãdhe–

SɔKOle : Se li! rabon bæta tobu mɔreni – bætar jan to khub kɔra!

jambuban : ei honuman bætai to mati Kolle - tɔKhon rabonKe Somuddre Phele dilei gol cuke jeto-na, bæta abar bidde jahir Korte gieche – 'æKKebare more gæche'-

bibhiSɔn : cor pala*l*e buddhi bare-/

lɔKKhoner SoktiSel / Sukumar raẽ/

৪.৬.৩ যতি/সংযোগ/সন্ধান/সংহিতা

বাংলা বাক্যে, বাক্যাংশ, শব্দ, এমনকি শব্দের অভ্যন্তরেও বিভিন্ন মাপের যতি দেখা যায়। দুই বাক্যে মধ্যবর্তী যতির মাপ সবয়েচে বড়ো এবং সম্ভবত শব্দস্থ দল বা অক্ষরগুলি মাঝের যতি সবচেয়ে ছোটো মাপের।

৪.৬.৪ দৈর্ঘ্য

বাংলায় স্বর বা ব্যঞ্জন কোনো ধ্বনিরই দৈর্ঘ্য ভেদ নেই অর্থাৎ হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদের শব্দের কোনো অর্থ পরিবর্তন হয় না।

৪.৭ আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা (International Phonetic Alphabet or IPA)

ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি যে বাংলায় লেখার ভাষার একক আর মুখের ভাষার এককে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। অর্থাৎ বাংলা লেখা দিয়ে বাংলার নিজস্ব উচ্চারণকে সঠিকভাবে ধরা যায় না। যেমন, আমরা লিখি এক, এখন কিন্তু বলি এ্যাক, এ্যাখোন।

বানান ও উচ্চারণের এই পার্থক্য পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই বর্তমান। তাই ধ্বনিবিজ্ঞানীরা পৃথিবীর যে কোনো ভাষার সঠিক উচ্চারণ লিখিত সংকেতের সাহায্যে লিপিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তৈরি করলেন আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা বা IPA। এর বৈশিষ্ট্যগুলি হল ঃ

ক) এ-যাবৎ কাল পর্যন্ত আবিষ্কৃত পৃথিবীর ভাষাসমূহে যতরকম ধ্বনি পাওয়া গেছে তার সবই এখানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

খ) ধ্বনি নির্দেশের সংকেত প্রধানত রোমীয় ও কিছু কিছু গ্রিক বর্ণমালা থেকে গৃহীত। এছাড়াও প্রয়োজন মতো ওপরে বা নীচে জুড়ে দেওয়া বাড়তি চিহ্নের সাহায্যও নেওয়া হয়। যেমন, নীচে জোড়া হল [t̪]টা, আবার ওপরে জোড়া [tʰ] হল ঠ ইত্যাদি।

গ) প্রতিটি সংকেতের সুনির্দিষ্ট ধ্বনিমূল্য আছে যেমন [p] = প, [k] = ক, [n] = ন ইত্যাদি।

ঘ) একটি সংকেত প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই নির্দিষ্ট ধ্বনিমূল্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন, বাংলার ক্ষেত্রে যেখানে অ-এর উচ্চারণ অনেক শব্দের অ-এর মতো সেখানে সংকেত [ɔ] ব্যবহৃত হবে। কিন্তু অ-এর উচ্চারণ যদি অতি শব্দের অ-এর মত অর্থাৎ ও-এর মতো হয় তবে সংকেত [O] ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ প্রতিটি IPA সংকেত উচ্চারণ অনুযায়ী ব্যবহার হবে, বানান অনুযায়ী নয়।

ঙ) বিভিন্ন সংকেত সম্বলিত IPA-র তালিকা থেকে শুধুমাত্র বাংলা উচ্চারণের জন্য প্রয়োজনীয় সংকেতগুলোর সাহায্যে বাংলা স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলিকেও দেখানো হয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা ৩১টি ব্যঞ্জন, ৭টি মৌখিক স্বর ও ৭টি অনুনাসিক স্বর—মোট ৪৫টি ধ্বনি ও ধ্বনির সংকেত ব্যবহার করে বাংলা ভাষার যে কোনো কথা বাংলার নিজস্ব উচ্চারণে লিপিবদ্ধ করতে পারি। এইভাবে উচ্চারণ লিপিবদ্ধ করার প্রক্রিয়াকে বলে লিপ্যন্তর। নীচে লিপ্যন্তরের উদাহরণ দেওয়া হল।

তখন বাক্যের শব্দের সঙ্গো সঙ্গো গলার সুরের এই যে নিচু থেকে উঁচু হয়ে যাওয়া, বা যখন বিবৃতি দেওয়া হচ্ছে—

গলার সুর ঃ

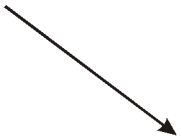

স্বর-ব্যঞ্জন ঃ [brisṭ i poṛche]।

তখন বাক্যের শেষে সুরের নিচু হয়ে যাওয়া—এগুলিও বিভিন্ন ধ্বনি বলে গণ্য। এগুলি ভাষার গুরুত্বপূর্ণ ধ্বনি কারণ এই ধ্বনির সাহায্যেই আমরা প্রশ্ন, বিবৃতি, বিস্ময় ইত্যাদি সূচক বাক্যগুলোকে আলাদা আলাদাভাবে চিনতে পারি। কিন্তু এই ধ্বনিগুলিকে যেহেতু স্বর-ব্যঞ্জনের মতো ভাগ করে বা কেটে আলাদা করে দেখানো যায় না তাই এদের বলে অবিভাজ্য বা অবিভাজিত বা বিভাজনাতিরিক্ত ধ্বনি কেউ কেউ একে অধিধ্বনিও বলেছেন। রামেশ্বর শ-র ভাষায় এই অবিভাজ্য ধ্বনিগুলি ভাষায় ছন্দের ধর্ম সঞ্চার করে বলে এগুলিকে ছন্দোগুণও বলে। বিভাজ্য ধ্বনি হল ভাষার মূল বা প্রাথমিক ধ্বনি, আর অবিভাজ্য ধ্বলি হল ভাষার গৌণ ধ্বনি।

অবিভাজ্য ধ্বনি বিভিন্ন রকমের হয়। যেমন,

৪.৬.১ সুর/স্বর/স্বরাঘাত/সুরাঘাত

বাংলায় সুরের বিভিন্নতা বিভিন্ন ধরনের বাক্য চিনতে সাহায্য করে।

বাংলায় সুরের প্রকারভেদ প্রধানত তিন ধরনের।

ক) **ঊর্ধ্ব থেকে নিম্নগামী বা অবরোহী ঃ** সাধারণ বিবৃতিমূলক বাক্যে, আদেশ নির্দেশ অনুরোধমূলক বাক্যে সুর অবরোহী। যেমন,

দরজা বন্ধ করো।

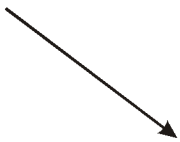

এখানে সুর উচ্চগাম থেকে নিম্নগ্রামে নামছে।

খ) **নিম্ন থেকে উর্ধ্বগামী বা আরোহী ঃ** হ্যাঁ না উত্তরের প্রশ্নাবোধক বাক্যে সুর নিম্নগ্রাম থেকে উচ্চগ্রামে ওঠে অর্থাৎ সুর আরোহী। যেমন,

দরজা বন্ধ করেছো ?

গ) **সমান্তাল ঃ** সংশয় বা, দ্বিধামূলক বাক্যে সুর সমান্তরাল। যেমন,

দরজাটা বোধহয় বন্ধ।

৪.৬.২ শ্বাসাঘাত/ঝোঁক/বল/প্রস্বন

ধ্বনিবজ্ঞানীদের মতে বাংলায় প্রতি শব্দের প্রথম দল বা অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ে, তবে এই শ্বাসাঘাতের ফলে শব্দের অর্থ বদলে যায় না বলে এর ধ্বনিতাত্ত্বিক গুরুত্ব নেই।

● **অঘোষীভবন**

কোনো ঘোষধ্বনির অঘোষবৎ হয়ে যাওয়াকে অঘোষীভবন বলে। যেমন, বড় + ঠাকুর [b⊃ṛo+ṭhakur] হয় [b⊃ṭṭhakur] খবর [kh⊃bor] হয় খপর [kh⊃por] ইত্যাদি।

● **অল্প প্রাণীভবন**

মহাপ্রাণ ধ্বনির অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হওয়াকে অল্পপ্রাণীভবন বলে। যেমন কাঁধ [k□dh] হয় কাঁদ [k□d], মাঘ [magh] হয় মাগ [mag] ইত্যাদি।

● **বিষমীভবন**

দুটি অভিন্ন ব্যঞ্জন ধ্বনির ভিন্ন হয়ে যাওয়াকে বিষমীভবন বলে। লাঙল [layol] হয় [nayol] লাল [lal] হয় [nal] ইত্যাদি।

ধ্বনি পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়াগুলিই বহুল প্রচলিত। তবে এ ছাড়াও আরও কিছু অল্প প্রচলিত প্রক্রিয়াও ভাষায় দেখা যায়।

৪.৬ বিভাজ্য ও অবিভাজ্যধ্বনি

ধ্বনিসত্তার প্রকৃতি অনুসারে যে-কোনো ভাষায় দু-ধরনের ধ্বনি পাওয়া যায়—বিভাজ্য ধ্বনি ও অবিভাজ্য ধ্বনি।

স্বর এবং ব্যঞ্জন ধ্বনি হল বিভাজ্য ধ্বনি। কারণ কোনো বাক্যে বিন্যস্ত স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলিকে সুস্পষ্ট ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—[bristiporchĕ] (বৃষ্টি পড়ছে)। এই বাক্যটিকে স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনিতে ভাঙা যায়। এইভাবে [b+r+i+S+ṭ+i p+o+ṛ+ch+e]। এই স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলো পরপর সারিবদ্ধভাবে বিন্যস্ত বলেই এদের এইভাবে ভাগ করা যায়। আর ভাগ করা যায় বলেই এরা **বিভাজ্য ধ্বনি**।

ভাষায় বিভাজ্য ধ্বনি ছাড়াও আরও কিছু ধ্বনি থাকে যাতে স্বর ব্যঞ্জনের মতো পৃথক পৃথক এককে ভাগ করা যায় না, কারণ তার স্বর ব্যঞ্জনের মতো পরপর সারিবদ্ধভাবে থাকে না। বরং স্বর ব্যঞ্জনের সঙ্গে একসঙ্গে একটানা উচ্চারিত হয়। যেমন, যখন প্রশ্ন করি,

গলার সুর ঃ

স্বর-ব্যঞ্জন ঃ [bristi porchĕ]।

● অপিনিহিতি

অপিনিহিতে স্বর ও ব্যঞ্জনের পারস্পরিক স্থান পরিবর্তন ঘটে। যেমন, চারি [cari] হয় চাইর [cair] ইত্যাদি।

● পরিবর্তন

একটি ধ্বনির বদলে অন্য ধ্বনি উচ্চারিত হলে তাকে পরিবর্তন বলে। পরিবর্তন নানান ধরনের। নীচে কয়েকরকম পরিবর্তন উল্লেখ করা হল।

● সমীভবন

উচ্চারণের সময় অনেক ক্ষেত্রেই পাশাপাশি দুটি বিভিন্ন ব্যঞ্জন পরস্পরের অথবা একে অপরের প্রভাবে অল্পবিস্তর সাম্যলাভ করে, ফলে তাদের চেহারার কিছু পরিবর্তন হয়। এই প্রক্রিয়ার নাম সমীভবন। যেমন, আব্দুল + রহমান হয়ে যায় আব্দুর রহমান ইত্যাদি [abdul + r ⊃ homan > abdur r ⊃ homan]।

● স্বরসঙ্গতি

উচ্চ স্বরধ্বনি [i] বা [u] শব্দে তার পূর্ববর্তী অনুচ্চ স্বরধ্বনি [e, æ, ⊃, o]-কে একধাপ উঁচুতে টেনে তুলে যথাক্রমে [i, e, o, u]-তে পরিণত করে। এইভাবে টেনে তুলে কাছাকাছি স্বরধ্বনির উচ্চতার সঙ্গতি স্থাপন করারেই স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন, লেখো, [*l*ikho] > লিখি [*l*ikhu]। এখানে পরবর্তী [i]-র টানে পূর্ববর্তী [e] পর্যবসিত হয়েছে [i]-তে। এইভাবেই আমরা পাই [dækho-dekhi] দ্যাখো-দেখি, [Soe-Sui] শোয়-শুই ; [k⊃ro-Koruk] করো-করুক, [tora-tui] ইত্যাদি।

● নাসিক্যভবন

কোনো মৌখিক স্বরধ্বনির অনুনাসিক স্বরে পরিবর্তিত হওয়াকে নাসিক্যীভবন বলে। নাসিক্যীভবন সাধারণত পার্শ্ববর্তী কোনো নাসিক্য ধ্বনির প্রভাবে হয়। যেমন, [hindu] হিন্দু হয় [hĨdu] হিঁদু, তামা [tama] হয় তাঁবা [tãba] ইত্যাদি।

বাংলায় কখনো কখনো কোনো নাসিক্য ধ্বনির ছাড়াও নাসিক্যীভবন ঘটে। একে বলে স্বতঃনাসিক্যীভবন। যেমন [hospital] থেকে হয়েছে হাঁসপাতাল [hãspatal] ইত্যাদি।

● উষ্মীভবন

উষ্মধ্বনি ছাড়া অন্যধ্বনির উষ্মধ্বনিতে পরিণত হওয়াকে উষ্মীভবন বলে। যেমন, গাছ + তলা [gach + t⊃la] হয় [gaSt⊃la], সেজো + দা [Sejo + da] হয় [Sezda] ইত্যাদি।

● ঘোষীভবন

অঘোষ ধ্বনি কখনো কখনো ঘোষ ধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়। এই প্রক্রিয়াই ঘোষীভবন। [Sak] শাক হয় [Sag], কাক [Kak] হয় [Kag] ইত্যাদি।

ধ্বনিকেই শ্রুতিধ্বনি বলে। যেমন 'মা আমায় ঘুরাবি কত' আমাদের উচ্চারণে দাঁড়ায় মায়ামায় ঘুরাবি কত [maẽamaẽ ghurabi kto] বা সে আসে ধীরে হয় সেয়াসে ধীরে [seẽaSe dhire] ইত্যাদি।

● স্বরাগম

অনেক সময় শব্দের আদিতে, মধ্যে বা অন্ত্যে স্বরধ্বনির আগম হয়—একেই সাধারণভাবে স্বরাগম বলে।

শব্দের আদিতে স্বরাগমকে আদিস্বরাগম বলে। যেমন, স্ত্রী [stri] হয় ইস্ত্রী [istri]।

শব্দের অন্তে স্বরাগমকে অন্ত্যস্বরাগম বলে। যেমন, বেঞ্চ [benc] হয়ে যায় বেঞ্চি [benc i̤]।

শব্দের মধ্যে অনেক সময় উচ্চারণের সুবিধার জন্য যুক্ত ব্যঞ্জনের মধ্যে একটি স্বরধ্বনির আগম ঘটে। এই স্বরাগমকে স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ বা মধ্যস্বরাগম বলে। যেমন, গ্রাস [graS] হয় গরাস [g⊃raS], গ্রাম [gram] হয় গেরাম [geram] ইত্যদি।

● লোপ বা বিয়োগ

উচ্চারণ দ্রুতির বা সরলীকরণের জন্য অনেক সময় শব্দে ধ্বনি লোপ হয়। সাধারণভাবে একেই বলে লোপ বা বিয়োগ।

● স্বরলোপ

শব্দের আদিতে, মধ্যে বা অন্তে স্বরধ্বনির লোপকে স্বরলোপ বলে।

শব্দের আদিতে স্বরধ্বনির লোপকে বলে আদিস্বরলোপ। যেমন, [Esplanade] এসপ্ল্যানেড [esplæned] হয়ে যায় স্প্ল্যানেড [splæned]।

শব্দের মধ্যে স্বরলোপকে বলে মধ্যস্বরলোপ। যেমন, বসতি [b⊃Soti] হয়ে যায় বস্তি [bosti]।

শব্দান্ত স্বরলোপকে বলে অন্ত্যস্বরলোপ। যেমন, অগুরু [⊃guru] হয়ে যায় আগর [agor]।

● সমাক্ষর লোপ

একই রকম দুটি অক্ষর বা দলের মধ্যে একটির লোপকে সমাক্ষর লোপ বলে। যেমন, ঠাকুরদাদা [ṭhakurdada] হয় ঠাকুরদা [ṭhakurda] কৃষ্ণনগর [KriSnonagor] হয় কৃষ্ণগর [KriSn⊃gor]।

● বিপর্যাস বা বিকার

শব্দমধ্যে দুটি ধ্বনির পারস্পরিক স্থান পরিবর্তনকে বিপর্যাস বা বিকার বলে।

● বিপর্যাস

সাধারণত দুটি ব্যঞ্জনধ্বনির স্থান পরিবর্তনই বিপর্যাস নামে পরিচিত। যেমন, তলোয়ার [t⊃loar] হয় তরোয়াল [t⊃roal], রিক্সা [rikSa] হয় রিস্কা [riSka] ইত্যাদি।

a	kata	কাটা	ã	kãta	কাঁটা
ə	dəl	দল	ə̃	gə̃d	গঁদ
o	*l*ok	লোক	õ	jõk	জোঁক
u	nun	নুন	ũ	kũṛi	কুঁড়ি

৭) যখন উচ্চারণের সময়ে কোনো স্বরধ্বনির প্রকৃতি বা quality বদলে যায় তখন তাকে দ্বিস্বর ধ্বনি বলে। যেমন, oi̯ boi̯ বই, doi̯ দই

ou̯ bou̯ বউ, mou̯ মৌ

বাংলায় মোট কটি দ্বিস্বর ধ্বনি আছে তা নিয়ে ধ্বনিবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতের বিভিন্নতা দেখা যায়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও রামেশ্বর শ-র মতে বাংলায় দ্বিস্বর ২৫টি, পবিত্র সরকারের মতে ১৭টি আবার সুকুমার সেনের মতে ২টি।

বাংলায় বিভিন্ন স্বরধ্বনি পরপর উচ্চারিত হয়ে ত্রিস্বর বা চতুঃস্বর ধ্বনিও গঠন করে। যেমন ত্রিস্বর—aui haui-হাউই oao noao নোয়াও, চতুঃস্বর—aoai daoi দাওয়াই ইত্যাদি।

৪.৫ ধ্বনি পরিবর্তন

আলোচনার খাতিরে বাংলার ব্যঞ্জন ও স্বরধ্বনিগুলিকে এক একটি বিচ্ছিন্ন একক হিসেবে বিশ্লেষণ ও তালিকাভুক্ত করা হলেও বলা বাহুল্য বাস্তবে মুখের ভাষায় বিভিন্ন ধ্বনি আসে অবিচ্ছিন্ন ধারায়। মুখের ভাষার এই অবিচ্ছিন্ন ধারার কারণে প্রতিটি ধ্বনিই তার আশপাশের ধ্বনিগুলোর ওপর প্রভাব বিস্তার করে। ফলে ধ্বনিগুলোর উচ্চারণে বিভিন্ন বৈচিত্র্য দেখা যায়। এই বৈচিত্র্যের ফলে কখনো একটি অন্য ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়, কখনো দুটি ধ্বনি পরস্পরের মধ্যে স্থান পরিবর্তন করে, কখনো কোনো ধ্বনি লোপ পায়, কখনো বা কোনো ধ্বনি অনাহূত এসে যায়। এই সব প্রক্রিয়াকে বলে ধ্বনি পরিবর্তন।

বাংলায় মোট চার ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন দেখা যায়—

আগম বা যোগ

লোপ বা বিয়োগ

বিপর্যাস বা বিকার ও পরিবর্তন

● **আগম বা যোগ**

উচ্চারণকালে অনেক সময় দেখা যায় উচ্চারণ প্রযত্ন লাঘবের জন্য বা সরলীকরণের জন্য শব্দের নানান স্থানে বিভিন্ন ধ্বনি যোগ হয়। একেই বলে ধ্বনি আগম বা যোগ। বিভিন্ন ধরনের আগম নীচে দেওয়া হল ঃ

● **শ্রুতিধ্বনি**

আমরা কথা বলার সময়ে প্রতিটি শব্দ কেটে কেটে আলাদাভাবে উচ্চারণ করি না, উচ্চারণ করি অবিচ্ছিন্নভাবে, উচ্চারণের এই অবিচ্ছিন্নতার জন্য মাঝে মাঝেই অনভিপ্রেত ধ্বনির আগমন ঘটে—এই

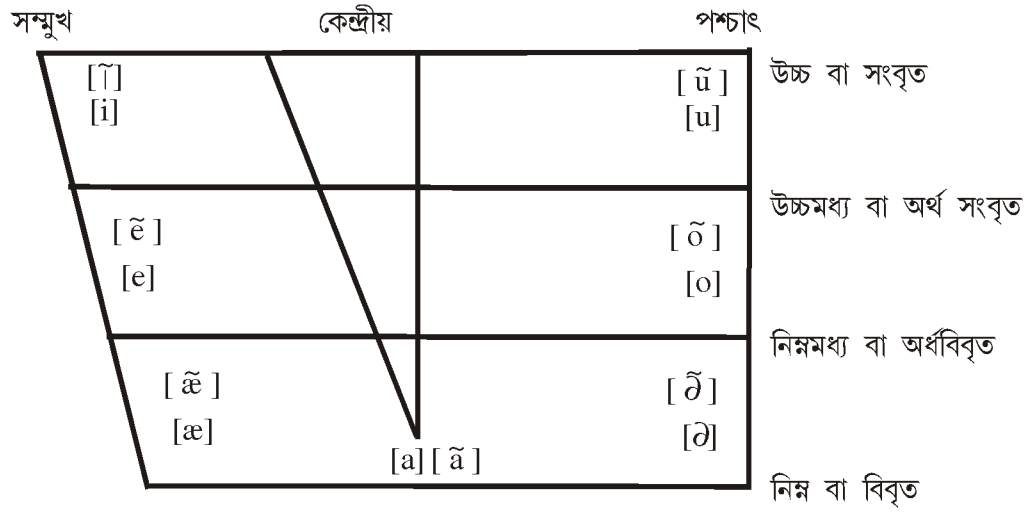

বাংলা স্বরধ্বনি

৪.৪.৪ বাংলা স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ

বাংলায় সাতটি মৌখিক স্বরধ্বনি ও সাতটি অনুনাসিক স্বরধ্বনি। মৌলিক স্বরধ্বনির পরিপ্রেক্ষিতে এদের অবস্থান নীচের মতো ঃ

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ঃ

১) স্বরধ্বনির কোনোটিরই উচ্চারণ মৌলিক স্বরধ্বনির বিন্দুতে নয়।

২) i, e, æ ও ĩ, ẽ, æ̃, সম্মুখ, u, o, ∂ ও ũ, õ, ∂̃ পশ্চাৎ ; i, u ও ĩ, ũ উচ্চসংবৃত e, o ও ẽ, õ উচ্চ-মধ্য/অর্ধসংবৃত, æ, ∂ ও æ̃, ∂̃ নিম্ন-মধ্য/অর্ধবিবৃত ও a ও ã কেন্দ্রীয় নিম্ন-বিবৃত বলে পরিচিত।

৩) ঠোঁটের আকৃতি অনুযায়ী i, e, æ ও ĩ, ẽ, æ̃ প্রসারিত ∂, o, u ও ∂̃, õ, ũ কুঞ্চিত ও a ও ã স্বাভাবিক।

৪) বাংলা উচ্চারণে দীর্ঘস্বর নেই।

৫) বাংলায় অনুনাসিকতা শব্দের অর্থ পরিবর্তন করে। যেমন—আট ও আঁট, কুড়ি ও কুঁড়ি ইত্যাদি।

৬) ৭টি মৌখিক ও সাতটি অনুনাসিক স্বরধ্বনির উচ্চারণ সংকেত নীচে দেওয়া হল ঃ

i	din	দিন	ĩ	ĩdur	ইঁদুর
e	chele	ছেলে	ẽ	ẽkebẽke	এঁকে বেঁকে
æ	ækta	একটা (এ্যাকটা)	æ̃	pæ̃ca	প্যাঁচা

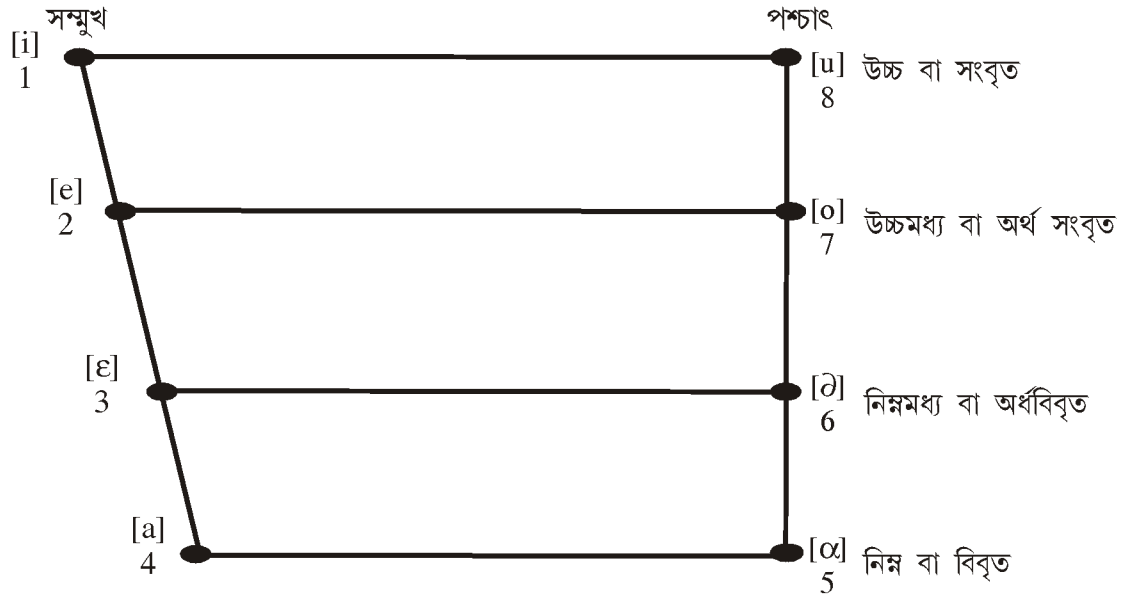

মৌলিক স্বরধ্বনি

১—৮ পর্যন্ত স্বরধ্বনির চিহ্নগুলি কোনো নির্দিষ্ট ভাষার স্বরধ্বনি নয়—স্কেলের আটটি নির্দিষ্ট বিন্দু মাত্র। এদের চিহ্ন বা সংখ্যা—যে-কোনো উপায়ে নির্দেশ করা হয়।

১, ২, ৩, ৪/i, e, ɛ, a হল সম্মুখ জিহ্বার সাহায্যে উচ্চারিত সম্মুখ স্বরধ্বনি ; ৫, ৬, ৭, ৮/ɑ, ə, o, u হল পশ্চাৎ জিহ্বার সাহায্যে উচ্চারিত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি।

১/i উচ্চারণে সম্মুখ জিহ্বা সর্বোচ্চ/সংবৃত অবস্থানে থাকে ; ২/e এর ক্ষেত্রে উচ্চ-মধ্য/অর্ধ সংবৃত বিন্দুতে, ৩/ɛ এর ক্ষেত্রে নিম্ন-মধ্য/অর্ধ বিবৃত বিন্দুতে এবং ৪/a এর ক্ষেত্রে নিম্ন/বিবৃত বিন্দুতে থাকে।

অনুরূপে ৫/ɑ, ৬/ə, ৭/o, ৮/u এর ক্ষেত্রে পশ্চাৎ জিহ্বার যথাক্রমে নিম্ন/বিবৃত, নিম্ন-মধ্য/অর্ধ বিবৃত, উচ্চ-মধ্য/অর্ধ সংবৃত ও উচ্চ/সংবৃত অবস্থান উচ্চারণে অংশগ্রহণ করে।

আপনারা একাদিক্রমে ই(i), এ(e), অ্যা(ɛ), আ(a) এবং উ(u), ও(o), অ(ə), আ(ɑ) উচ্চারণ করে দেখলেই জিভের দুরকম ভূমিকা সহজেই অনুভব করতে পারবেন।

সাধারণত সম্মুখ স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে ঠোঁট প্রসারিত থাকে। সবথেকে বেশি প্রসারি e-র ক্ষেত্রে। পশ্চাৎ স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে ঠোঁট কুঞ্চিত অবস্থায় থাকে, সর্বাধিক o ও u-র ক্ষেত্রে।

উপরোক্ত আটটি হল মুখ্য প্রাথমিক স্বরধ্বনি। এছাড়াও আরও দশটি গৌণ মৌলিক স্বরধ্বনি আছে যার আলোচনা এখানে অপ্রয়োজনীয়।

b	bon	বোন	bh	bhai	ভাই
y	banyla	বাংলা	n	nam	নাম
m	ma	মা	h	hat	হাত
S	Ses	শেষ	s	sthan	স্থান
r	rat	রাত	*l*	*lal*	লাল
ṛ	gari	গাড়ি	ŏ	khaŏ	খাও
ĕ	jaĕ	যায়			

৪.৪.৩ স্বরধ্বনি

আগেই বলেছি যে যেহেতু স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ পদ্ধতি আলাদা তাই এই দুধরনের ধ্বনির ধ্বনিবিজ্ঞান সম্মত শ্রেণিবিভাগের রীতিও আলাদা।

স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে কণ্ঠ বা মুখগহ্বরে কোথাও কোনোরকম উচ্চারণের বাধা থাকে না শ্বাসবায়ু নিরবিচ্ছিন্নভাবে মুখ দিয়ে নির্গত হয়। স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে শ্বাসবায়ুর যাতায়াতের পথের আকৃতির ওপর স্বরধ্বনির বিভিন্নতা নির্ভর করে। এই পথের আকৃতি প্রধানত তিনটি মাপকাঠির ওপর নির্ভর করে।

ক) **জিভের উচ্চতা** — অর্থাৎ জিভ তার স্বাভাবিক অবস্থানে রয়েছে না তার চেয়ে উঁচুতে রয়েছে? উঁচুতে থাকলে কতটা উঁচুতে রয়েছে?

জিভের স্বাভাবিক অবস্থান থেকে স্বরধ্বনির জন্য প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ অবস্থান পর্যন্ত উচ্চতাকে চারটি আপেক্ষিক বিন্দুতে ভাগ করা হয়—নিম্ন, নিম্ন-মধ্য, উচ্চ-মধ্য ও উচ্চ। জিভের নিম্ন বা স্বাভাবিক অবস্থানে মুখগহ্বরে শূন্যস্থানের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি তাই নিম্ন বিন্দুর আরেক নাম বিবৃত। জিভের নিম্ন-মধ্য অবস্থানে শূন্যস্থানে পরিমাণও কিছু কম তাই এই বিন্দুর নাম অর্ধবিবৃত। অনুরূপে উচ্চ-মধ্য হল অর্ধ-সংবৃত ও উচ্চ বিন্দু সংবৃত।

খ) **জিভের অংশ** — অর্থাৎ সম্মুখ জিহ্বা না পশ্চাৎ জিহ্বা—কোন অংশের উচ্চতা গুরুত্বপূর্ণ।

গ) ঠোঁটের আকৃতি—ঠোঁট দুটি গোল হয়ে কুঞ্চিত, না সমান্তরালে প্রসারিত।

এই তিন মাপকাঠির ভিত্তিতে যে-কোনো ভাষার স্বরধ্বনি মাপবার জন্য একটি স্কেল কল্পনা করা হয়েছে—যার নাম মৌলিক স্বরধ্বনি স্কেল। খুব সংক্ষেপে এই মৌলিক স্বরধ্বনির স্কেলে আটটি কাল্পনিক স্বরধ্বনির সুনির্দিষ্ট অবস্থান দেখানো থাকে।

স্কেলটি নীচের মতো ঃ

অন্যান্য অনেক ভাষার মতো বাংলাতেও লেখার ভাষার রীতিনীতি ও মুখের ভাষার রীতিনীতি এক নয়। লেখার ভাষার ক্ষুদ্রতম একক বর্ণ ও মুখের ভাষার ক্ষুদ্রতম ধ্বনি সবসময় ১:১ সমীকরণে সম্পর্কিত হয় না। যেমন—আমরা লিখি ন, ণ, কিন্তু উচ্চারণ করি শুধুমাত্র দন্তমূলীয় নাসিক্য ধ্বনি ন/n; লিখি য, জ, কিন্তু বলি তালুদন্তমূলীয় ঘৃষ্ট জ/j; লিখি শ, স, ষ কিন্তু উচ্চারণ করি তালুদন্তমূলীয় শ/S; কখনো কখনো দন্ত্য স/s ইত্যাদি।

আমি এতক্ষণ আপনাদের বোঝানোর সুবিধের জন্য লেখায় ব্যবহৃত বর্ণ দিয়েই উচ্চারণের ধ্বনিগুলির নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু লেখার একক দিয়ে উচ্চারণের একক নির্দেশ করার সমস্যা হল এই যে—বাংলা বর্ণমালায় লেখার একক হিসাবে ৪০টি (যুক্তবর্ণ বাদে) ব্যঞ্জনবর্ণ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু উচ্চারণের একক হিসেবে মাত্র ৩১টি (ডঃ সুনীতি কুমার চ্যাটার্জীর হিসেবে) ব্যঞ্জনধ্বনি আমরা মুখের কথায় ব্যবহার করি। দুটি সংখ্যার ফারাকটাই সমস্যার কারণ।

তাই এখন থেকে সমস্যা এড়াবার জন্য আমি ধ্বনিবিজ্ঞানের রীতি অনুসারে বাংলা ধ্বনিগুলি নির্দেশ করার জন্য বাংলা বর্ণের বদলে আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালার International Phonetic Alphabet বা IPA চিহ্ন ব্যবহার করব। আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় পরে আসছি। আপাতত এই বর্ণমালার যে চিহ্নগুলি বাংলার জন্য প্রয়োজনীয় সেগুলিই ব্যবহার করছি। এই চিহ্নগুলির সুনির্দিষ্ট ধ্বনিমান আছে এবং এই ধ্বনিমান সবক্ষেত্রেই এক। যেমন—IPA চিহ্ন K-এর নির্দিষ্ট ধ্বনিমান হল বাংলা ক্-এর উচ্চারণ।

বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিবিভাগে আমি কোনো বাংলা বর্ণ ব্যবহার না করে শুধুমাত্র IPA চিহ্ন ব্যবহার করছি। এ পর্যন্ত ধ্বনিব্যঞ্জনের যা আলোচনা হয়েছে তা বুঝে থাকলে এই চিহ্নগুলোর ধ্বনিমান বুঝতে অসুবিধা হবে না। প্রথমে দেখুন তো প্রতিটি চিহ্নের ধ্বনিমান বুঝতে পারছেন কিনা। তারপর নিজেদের উত্তর নীচে দেওয়া বাংলা শব্দগুলোর উচ্চারণের ভিত্তিতে মিলিয়ে নিন।

K	Kan	কান	Kh	Khaṭ	খাট
g	gan	গান	gh	ghi	ঘি
c	cil	চিল	ch	chata	ছাতা
j	jama	জামা	jh	jhol	ঝোল
ṭ	taka	টাকা	ṭh	ṭhik	ঠিক
ḍ	ḍim	ডিম	ḍh	ḍhil	ঢিল
t	tin	তিন	th	thala	থালা
d	din	দিন	dh	dhan	ধান
p	pahar	পাহাড়	ph	phul	ফুল

	ওষ্ঠ্য	দন্ত্য	দন্তমূলীয়	মূর্ধন্য	তালুদন্তমূলীয়	তালব্য	কণ্ঠ্য	স্বরতন্ত্রীয়
স্পর্শ	p b ph dh	t d th dh		ṭ ṭh ḍ ḍh			k g Kh gh	
ঘৃষ্ট					c ch j jh			
নাসিক্য	m		n				ŋ	
পার্শ্বিক			ɛ					
কম্পিত			r					
তাড়িত				ṛ				
উষ্ম		s			S			ɦ
অর্ধস্বর	ö					ē		

সূনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯২৮) অনুসরণ করে প্রদত্ত বাংলার ৩১টি ব্যঞ্জনধ্বনির তালিকা

ঙ) **কম্পিত ধ্বনি**—কম্পিত ধ্বনি উচ্চারণের সময় দুটি উচ্চারকের পারস্পরিক সংযোগ খুব আলগা থাকে এবং শ্বাসবায়ু নির্গমনের সময় একটি অপরটির বিপরীতে নিয়মিত কম্পিত হয়। যেমন বাংলার দন্তমূলীয় র্।

চ) **তাড়িত ধ্বনি**—তাড়িত ধ্বনি উচ্চারণের ক্ষেত্রে সক্রিয় উচ্চারক হিসেবে অগ্রজিহ্বা নিষ্ক্রিয় উচ্চারক শক্ততালুর মাঝখানে একবার মাত্র টোকা মারে। বাংলায় মুর্ধণ্য ড়্, ঢ়্।

ছ) **পার্শ্বিক**—পার্শ্বিক ধ্বনি উচ্চারণে জিভের পিছন থেকে সামনে মাঝবরাবর রেখার ওপর কোনো জায়গায় দুটি উচ্চারকের সম্পূর্ণ সংযোগের ফলে শ্বাসবায়ু জিভের এক বা দুধার দিয়ে নির্গত হয়। যেমন বাংলায় দন্তমূলীয় ল্।

জ) **অর্ধস্বর**—অর্ধস্বর উচ্চারণের সময় দুটি উচ্চারকের পারস্পরিক সংযোগ উষ্মধ্বনির তুলনায় বেশি কিন্তু স্বরধ্বনির তুলনায় কম কাছাকাছি থাকে। ফলে শ্বাসবায়ু কোনো রকম ঘর্ষণজাত ধ্বনি উৎপন্ন না করেই অবিচ্ছিন্নভাবে নির্গত হয়। যেমন, বাংলা য়্, ওয়্।

ঝ) **মহাপ্রাণ-অল্পপ্রাণ**—মহাপ্রাণ ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী দুটির মাঝখানের স্বরপথ দিয়ে শ্বাসবায়ু নির্গমন কালে স্বরতন্ত্রী দুটি পরস্পরের কাছাকাছি এসে বেশ জোরে বাধার সৃষ্টি করায় একটি হ্ ধ্বনি শোনা যায়। এই হ্-কেই মহাপ্রাণতা বলে। এই হ্ যুক্ত ধ্বনিগুলিই মহাপ্রাণ ধ্বনি। বাংলায় খ্, ঘ্, ফ্, ভ্, ছ্, ঝ্, ঠ্, ঢ্, থ্, ধ্, অর্থাৎ বর্গের ২য় ও ৪র্থ ধ্বনি মহাপ্রাণ।

অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে এরকম কোনো হ্ ধ্বনি মিশে থাকে না। সাধারণত বর্গের ১ম ও ৩য় ধ্বনি অল্পপ্রাণ। যেমন, ক্, গ্, চ্, জ্, ট্, ড্, দ্, প্, ব্।

ডঃ রামেশ্বর শ ধ্বনির মহাপ্রাণতা অল্পপ্রাণতা গুণকে উচ্চারণ প্রকৃতি হিসেবেই বিবেচনা করেছেন।

৪.৪.২ বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিবিভাগ

মূলত চারটি দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিকরণ করা হয়।

১) ঘোষবত্তা অর্থাৎ ধ্বনিটি ঘোষ বা অঘোষ। সাধারণত বর্গের ১ম ও ২য় ধ্বনি অঘোষ এবং ৩য় ও ৪র্থ ধ্বনি ঘোষ।

২) ধ্বনিটি মহাপ্রাণ না অল্পপ্রাণ।

৩) উচ্চারণ স্থান ও

৪) উচ্চারণ প্রকৃতি

কোনো ধ্বনি উচ্চারণে ফুসফুস নির্গত বায়ু বহির্গামী না অন্তর্গামী তাও একটি বিচার্য দৃষ্টিকোণ। কিন্তু যেহেতু বাংলা ধ্বনি কেবলমাত্র বহির্গামী বাতাস দিয়েই উচ্চারণ হয় তাই বাংলা ধ্বনির শ্রেণিবিভাগের ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিকোণ গুরুত্বহীন।

উপরোক্ত চারটি দৃষ্টিকোণের ভিত্তিতে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিবিভাগের আগে একটি জরুরি কথা বলে নিই।

ঙ) তালু দন্তমূলীয়—সম্মুখ জিহ্বা ওপরে দন্তমূল ও তার পরবর্তী শক্ত তালুর সামনের অংশ স্পর্শ করে উচ্চারণ করে তালু দন্তমূলীয় ধ্বনি। যেমন—চ্, ছ্, জ্, ঝ্, শ্।

চ) কণ্ঠ্য—জিভের পিছনের অংশ নরম তালু স্পর্শ করে উচ্চারণ করে কণ্ঠ্য ধ্বনি। যেমন—ক্, খ্, গ্, ঘ্, ঙ/ং।

ছ) স্বরতন্ত্রীয় ধ্বনি—দুই স্বরতন্ত্রীর মাঝখান দিয়ে উচ্চারিত ধ্বনি। যেমন—হ্।

● **উচ্চারণ প্রকৃতি**

ওপরের উচ্চারকের সঙ্গে নীচের উচ্চারকের বিভিন্ন রকম সমন্বয় ঘটে—কখনো দুই উচ্চারক পরস্পরকে সম্পূর্ণ স্পর্শ করে, কখনো আংশিক স্পর্শ করে। কখনো পার্শ্বিক স্পর্শ করে, কখনো বা স্পর্শ না করে পরস্পর পরস্পরের এত কাছাকাছি আসে যে প্রতিহত শ্বাসবায়ু ঘর্ষণজনিত শব্দ করে নির্গত হয়। অর্থাৎ উচ্চারকের সমন্বয়ের বিভিন্ন ধরনের ওপর শ্বাসবায়ুর প্রতিহত হওয়ার প্রকৃতি নির্ভর করে।

উচ্চারণ প্রকৃতি বলতে বোঝায় উচ্চারকগুলো কেমনভাবে পরস্পরের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে শ্বাসবায়ুকে প্রতিহত করছে তারই বর্ণনা।

বাংলা ধ্বনির ক্ষেত্রে আমরা নিম্নবর্ণিত উচ্চারণ প্রকৃতিগুলি পাই—

ক) **স্পৃষ্ট/স্পর্শ**—এক্ষেত্রে উপরস্থ ও নিম্নস্থ দুটি উচ্চারক পরস্পরকে সম্পূর্ণ স্পর্শ করে শ্বাসবায়ুর গতিপথে ক্ষণকালের জন্য সম্পূর্ণ বাধা দেয়। তারপর উচ্চারক দুটি হঠাৎ পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে অবরুদ্ধ শ্বাসবায়ু নির্গত হয় ও ধ্বনি উচ্চারণ হয়।

বিভিন্ন উচ্চারণস্থানে আমরা স্পর্শধ্বনি উচ্চারণ করি। যেমন দুটি ঠোঁটকে সম্পর্ণ বন্ধ করে, শ্বাসবায়ু রুদ্ধ করে, তারপর হঠাৎ উন্মুক্ত করে পাওয়া যায় ওষ্ঠ্য স্পর্শ ধ্বনি—প্, ফ্, ব্, ভ্ ; জিভের পিছনের অংশ দিয়ে নরম তালু সম্পূর্ণ স্পর্শ করে, শ্বাসবায়ু রুদ্ধ করে তারপর উচ্চারক দুটিকে পরস্পরের থেকে হঠাৎ বিচ্ছিন্ন করে পাই কণ্ঠ্য স্পর্শ ধ্বনি—ক্, খ্, গ্, ঘ্। এইরকমই পাই দন্ত্য স্পর্শ ধ্বনি ত্, থ্, দ্, ধ্ ও মুর্ধ্যণ স্পর্শ ধ্বনি ট্, ঠ্, ড্, ঢ্।

খ) **নাসিক্য**—নাসিক্য ধ্বনির উচ্চারণ প্রকৃতি স্পর্শ ধ্বনিরই অনুরূপ। তফাত শুধু এক্ষেত্রে শ্বাসবায়ু নাসিকা গহ্বর দিয়ে নির্গত হয়। অর্থাৎ মুখগহ্বরে ওপরের ও নীচের উচ্চারক দুটি পরস্পর পরস্পরকে সম্পূর্ণ স্পর্শ করে শ্বাসবায়ু অবরুদ্ধ করে থাকে এবং সেই অবরুদ্ধ শ্বাসবায়ু ঝুলে থাকা নরমতালু ও আলজিভের পাশ দিয়ে নাসিকা গহ্বরে প্রবেশ করে নারারন্ধ্র দিয়ে নির্গত হয়। বাংলায় নাসিক্য ধ্বনি তিনটি—ওষ্ঠ্য নাসিক্য ম্, দন্তমূলীয় নাসিক্য ন্, ও কণ্ঠ্য নাসিক্য ঙ্।

গ) **উষ্মধ্বনি**—এক্ষেত্রে উচ্চারক দুটি পরস্পরের খুব কাছাকাছি আসার ফলে শ্বাসবায়ু যাতাযাতের পথে আংশিক বাধার সৃষ্টি হয় এবং সেই বাধা ঠেলে নির্গত হওয়ার ফলে ঘর্ষণজনিত ধ্বনি উৎপন্ন হয়। এইভাবে উচ্চারিত ধ্বনিই উষ্মধ্বনি। বাংলায় বিভিন্ন স্থানের উষ্মধ্বনিগুলি হল—তালুদন্তমূলীয় শ্ এবং স্বরতন্ত্রীয় হ্।

ঘ) **ঘৃষ্টধ্বনি**—দুটি উচ্চারকের মধ্যে প্রথমে স্পর্শ ধ্বনির মতোই সম্পূর্ণ সংযোগ স্থাপিত হয়ে শ্বাসবায়ু রুদ্ধ হয়, তারপর উচ্চারক দুটি পরস্পরের থেকে আস্তে আস্তে বিভিন্ন হবার ফলে উষ্মধ্বনির মতো আংশিক বাধার স্তর পেরিয়ে শ্বাসবায়ু পুরোপুরি নির্গত হয়। অর্থাৎ ঘৃষ্ট ধ্বনি যেন স্পর্শ ও উষ্ম ধ্বনির যৌগিক রূপ। বাংলার ঘৃষ্ট ধ্বনি হল তালুদন্তমূলীয় চ্, ছ্, জ্, ঝ্।

ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে কণ্ঠ বা মুখগহ্বরে একাধিক উচ্চারক মিলে কোনো না কোনো ধরনের বাধার সৃষ্টি করে ধ্বনি উৎপাদক শ্বাসবায়ুকে কোনো না কোনো ভাবে প্রতিহত করে। যেমন বাংলা, প্, ফ্, ব্, ভ্ ধ্বনির ক্ষেত্রে ওপরের ও নীচের ঠোঁট দুটি পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হলে ধ্বনিগুলি উচ্চারিত হচ্ছে।

কিন্তু বাংলা স্বরধ্বনি ই, উ, আ ইত্যাদির ক্ষেত্রে কণ্ঠ বা মুখগহ্বরে কোথাও এরকম কোনো উচ্চারকের বাধা থাকে না—শ্বায়বায়ু নিরবচ্ছিন্নভাবে ধ্বনি উৎপাদন করতে করতে মুখ দিয়ে নির্গত হয়।

যেহেতু স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ পদ্ধতি আলাদা আলাদা তাই তাদের ধ্বনি বিজ্ঞানসম্মত শ্রেণিবিভাগের রীতিও আলাদা। আমরা প্রথমে ব্যঞ্জনধ্বনির ও পরে স্বরধ্বনির উচ্চারণ পদ্ধতি ও শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করব।

৪.৪.১ ব্যঞ্জনধ্বনি

ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের ও শ্রেণিবিভাগের ক্ষেত্রে দুটি প্রধান মাপকাঠি হল ধ্বনির উচ্চারণ স্থান ও উচ্চারণ প্রকৃতি। অর্থাৎ ধ্বনিটি উচ্চারণ হচ্ছে কোথায় এবং কিভাবে।

● উচ্চারণ স্থান

একটি নির্দিষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় কোন কোন উচ্চারক পরস্পরকে সম্পূর্ণ বা আংশিক স্পর্শ করছে বা কোন কোন উচ্চারকের প্রচেষ্টায় উচ্চারণ সম্ভব হচ্ছে তারই নির্দেশ হল উচ্চারণ স্থান। অর্থাৎ কোন স্থানে ধ্বনির উচ্চারণ সম্পাদিত হচ্ছে তার বর্ণনা। অন্যভাবে বলা যায় যে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের ক্ষেত্রে কণ্ঠে বা মুখগহ্বরের কোন জায়গায় শ্বাসবায়ু প্রতিহত হচ্ছে তারই নির্দেশ করে উচ্চারণ স্থান। যেমন প্, ফ্, ব্, ভ্, ধ্বনির ক্ষেত্রে ওপর ও নিচের ঠোঁট পরস্পরকে সম্পূর্ণরূপে স্পর্শ করায় শ্বাসবায়ু প্রতিহত হচ্ছে। সুতরাং এই ধ্বনিগুলির উচ্চারণস্থান দুটি ঠোঁট/ওষ্ঠদ্বয়। তাই উচ্চারণস্থান অনুসারে এরা ওষ্ঠ ধ্বনি।

সাধারণত ওপরের বিভিন্ন উচ্চারকের নাম অনুসারে উচ্চারণস্থানের নামকরণ হয়। উচ্চারণস্থানের নাম অনুসারে সেই স্থানে উৎপন্ন ধ্বনির নামকরণ হয়।

বিভিন্ন নিম্নস্থ উচ্চারকের সঙ্গে বিভিন্ন উপরস্থ উচ্চারকের সমন্বয়ের ফলে বিভিন্ন উচ্চারণ স্থান তৈরি হয়। এইসব উচ্চারণ স্থানে উচ্চারিত ধ্বনি পৃথিবীর নানান ভাষায় পাওয়া যায়। তবে বর্তমান আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার ধ্বনির উচ্চারণ স্থানের বিস্তৃত আলোচনা করব না আমরা শুধুমাত্র বাংলা ভাষার ধ্বনি উচ্চারণের জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চারণস্থানগুলির আলোচনাতেই সীমিত থাকবে।

ক) ওষ্ঠ্য বা দ্বিওষ্ঠ্য—ওপরের ও নীচের দুটি ঠোঁটের সমন্বয়ে উচ্চারিত হয় ওষ্ঠ্য বা দ্বিওষ্ঠ্য ধ্বনি। যেমন—প্, ফ্, ব্, ভ্, ম্।

খ) দন্ত্য—জিহ্বা প্রান্ত ও অগ্রজিহ্বা ওপরের দাঁতের পিছনের অংশকে স্পর্শ করে উচ্চারণ করে দন্ত্য ধ্বনি। যেমন—ত্, থ্, দ্, ধ্।

গ) দন্তমূলীয়—জিহ্বা প্রান্ত দন্তমূলকে স্পর্শ করে উচ্চারণ করে দন্তমূলীয় ধ্বনি। যেমন—ন্, র্, ল্।

ঘ) মূর্ধন্য/প্রতিবেষ্টিত—জিভকে উলটে নিয়ে অগ্রজিহ্বার নীচের দিকে ঘুরিয়ে ওপর দিকে এনে শক্ত তালুর মাঝখানে স্পর্শ করে উচ্চারণ করা হয় মূর্ধন্য/প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি। যেমন—ট্, ঠ্, ড্, ঢ্।

ওপরের উচ্চারকের মধ্যে সামনে থেকে পিছনে প্রথমে উপরের ঠোঁট, তারপর ওপরের দাঁত, তারপর মুখের ছাদ বা তালু। মুখের ছাদের প্রথম অংশ দাঁতের ভিতরের দিকের মাড়ি বা দন্তমূল। দন্তমূল শক্ত ও একটু উঁচু মতো। তারপরের মসৃণ ও শক্ত অংশটুকু শক্ত তালু। শক্ত তালুকে আবার সম্মুখ, মধ্য ও পশ্চাৎ এই তিন ভাগে দেখানো যায়। শক্ত তালুর পরবর্তী নরম অংশ হল নরম তালু। নরম তালুর শেষ প্রান্ত থেকে ঝুলন্ত নরম মাংস পিণ্ডটা হল আলজিভ।

ওপরের ঠোঁট থেকে শুরু করে দাঁত, তালু হয়ে আলজিভ পর্যন্ত অংশ মুখগহ্বর থেকে নাসিকা গহ্বরকে পৃথক করে তা আগেই উল্লেখ করেছি।

নীচের উচ্চারকের মধ্যে সামনে থেকে পিছনে আসে নিচের ঠোঁট, নীচের দাঁত ও জিভ। দাঁত উচ্চারণে কোনো অংশ নেয় না। জিভকে আলোচনার সুবিধের জন্য আবার চারটি অংশে ভাগ করা যায়, জিভের ডগা প্রান্ত ; প্রান্ত পরবর্তী অগ্রজিহ্বা বা জিভের পাতলা অংশ, যা দন্তমূলের বিপরীতে থাকে ; জিভের মাঝ বরাবর ভাগ করে তার সামনের অংশ বা সম্মুখ জিহ্বা, শক্ত তালুর বিপরীতে থাকে এবং জিভের পিছনের অংশ বা পশ্চাৎ জিহ্বার একেবারে শেষ অংশ হল জিভের গোড়া—তারও একটি পিছনের অধিজিহ্বা—যা আগেই আলোচনা করেছি।

উচ্চারণগুলোর মধ্যে জিভ নড়াচড়া করে সবচেয়ে বেশি—ওপরে, নীচে, পিছনে ও দুপাশে।

মুখগহ্বর—নাসিকা গহ্বরের পিছনের প্রান্ত থেকে শুরু হয়েছে গলা বা কণ্ঠ বা কণ্ঠনালি। কণ্ঠনালির মধ্য দিয়ে সমান্তরালভাবে দেহের অভ্যন্তরে নেমে গেছে খাদ্যানালি বা শ্বাসনালি। আগেই বলেছি শ্বাসনালিতে রয়েছে স্বরকক্ষ।

উচ্চারকগুলির মধ্যে যেগুলি সক্রিয়ভাবে নাড়াচড়া করে স্বস্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে উচ্চারণে অংশগ্রহণ করে তাদের বলে সক্রিয় উচ্চারক। জিভ হল সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সক্রিয় উচ্চারক। আর অন্য যে উচ্চারক স্বস্থানে অবস্থিত থেকেই উচ্চারণে অংশ নেয় তাকে বলে নিষ্ক্রিয় উচ্চারক। যেমন—তালুর বিভিন্ন অংশ। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় বাংলা ধ্বনি র্, ল্, ন্, এর উচ্চারণে সক্রিয় উচ্চারক অগ্রজিহ্বা ও নিষ্ক্রিয় উচ্চারক দন্তমূল।

৪.৪ ধ্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি

এই কণ্ঠ ও মুখগহ্বরে উচ্চারিত ধ্বনিগুলিকে উচ্চারণ পদ্ধতির ভিত্তিতে দুটি মৌলিক শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি। এই **স্বরধ্বনি-ব্যঞ্জনধ্বনি** ও স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ নামের সঙ্গে আমরা সকলেই স্কুলের নিচু স্কাল থেকে পরিচিত। সুতরাং স্বরধ্বনি-ব্যঞ্জনধ্বনি আমাদের কাছে কোনো নতুন ধারণা নয়। এই পুরানো জানা ধারণাকেই আবার আলোচনা করার উদ্দেশ্য হল এই পরিচিত ধারণাকেই একটু অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে আরো একটি বেশি যুক্তিগ্রাহ্যভাবে বোঝার ও বোঝানোর চেষ্টা করা। এক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ঃ

১) এই মুহূর্তে আমাদের খুব সচেতনভাবে মনে রাখা দরকার যে স্বরধ্বনি-ব্যঞ্জনধ্বনি হল মুখের ভাষার বা কথা বলার উপাদান, আর স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণ হল লেখার ভাষার উপাদান। ধ্বনিবিজ্ঞান ও ধ্বনিতত্ত্বে আমাদের আলোচ্য বিষয় স্বরধ্বনি-ব্যঞ্জনধ্বনি, বর্ণ নয়।

২) আমরা স্বরধ্বনি-ব্যঞ্জনধ্বনিকে তাদের উচ্চারণ পদ্ধতির বিভিন্নতার যুক্তি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করব এবং নিজেরা মুখে ধ্বনিগুলি উচ্চারণ করে এই যুক্তির সত্যতা বিচার করব।

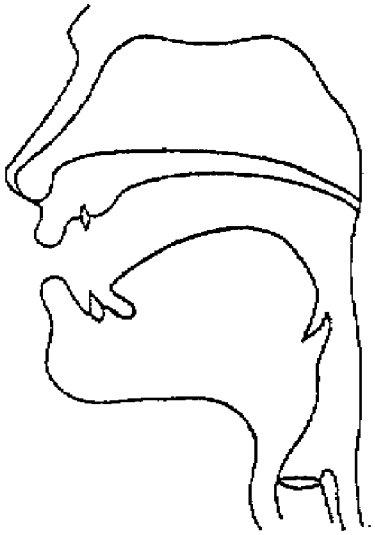

নাসিকা গহ্বরের প্রবেশ পথ বন্ধ।
নরম তালু ও আলজিভের এই রকম পিছনে ঠেকে থাকা অবস্থানে মৌখিক ধ্বনি উচ্চারিত হয়।

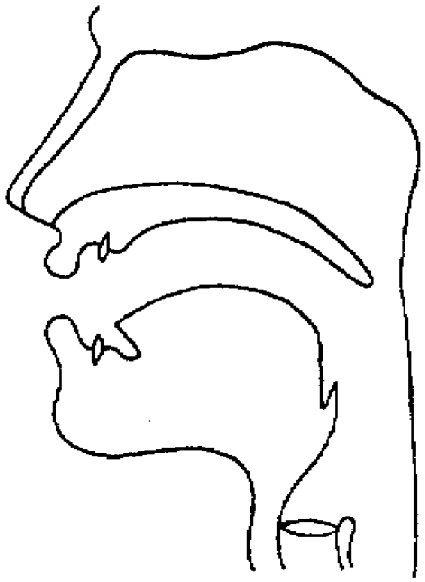

নাসিকা গহ্বরের প্রবেশ পথ বন্ধ।
নরম তালু ও আলজিভের এই রকম পিছনে ঠেকে থাকা অবস্থানে মৌখিক ধ্বনি উচ্চারিত হয়।

যদিও নরমতালু ও আলজিভ ওপরের দিকে উঠে নাসিকা গহ্বরের পিছনের দেওয়াল স্পর্শ করে নাসিকা গহ্বরের প্রবেশ পথ বন্ধু করে দেয় তাহলে শ্বাসবায়ু শুধুমাত্র মুখগহ্বরের দিয়েই নির্গত হয় এই মৌখিক ধ্বনি উৎপন্ন করে—যেমন, বাংলা অ, ই. উ, ক্, গ্, দ্, ট্, ব্, শ্ ইত্যাদি।

সংক্ষেপে ঃ নরমতালু ও আলজিভের বিভিন্ন অবস্থান ও মুখগহ্বরের বাধার উপস্থিতির ভিত্তিতে ধ্বনি উৎপাদনকারী শ্বাসবায়ু নিম্নলিখিত পথে নির্গত হয়—

ক) মুখগহ্বর দিয়ে, মৌখিক ধ্বনি উৎপন্ন করে।

খ) নাসিকাগহ্বর দিয়ে, নাসিক্য ধ্বনি উৎপন্ন করে।

গ) মুখ ও নাসিকা উভয় গহ্বর দিয়ে, অনুনাসিক ধ্বনি উৎপন্ন করে।

● **মুখগহ্বর**

মুখগহ্বরস্থ বিভিন্ন উচ্চারক অংশগুলি একে অপরকে বিভিন্নভাবে স্পর্শ করে বা একে অপরের কাছাকাছি এসে মুখগহ্বরের আকৃতির পরিবর্তন করে ধ্বনির বিভিন্ন চেহারার সৃষ্টি করে।

প্রথমে উচ্চারক অংশগুলোর পরিচয় দিই। বাগ্‌যন্ত্রের যেসব অংশ প্রত্যক্ষভাবে ধ্বনি উচ্চারণে অংশ নেয় সেগুলিই উচ্চারক বলে পরিচিত। যেমন, ঠোঁট, জিভ, তালু ইত্যাদি। সাধারণত যে উচ্চারকগুলো নীচের চোয়ালের সঙ্গে যুক্ত তাদের বলে নিম্নস্থ/নীচের উচ্চারক। আর ওপরের চোয়ালের সঙ্গে যুক্ত উচ্চারকগুলো হল উপরস্থ/ওপরের উচ্চারক, আমাদের নিচের উচ্চারক সহ নিচের চোয়াল নড়াচড়া করে।

স্বরতন্ত্রী দুটি যখন পরস্পরের সঙ্গে পুরোপুরি ঠেকে থাকে তখন স্বরপথ রুদ্ধ অবস্থায় থাকে। আমরা যখন কাশি তখন স্বরপথ এই পুরো বন্ধ অবস্থা থেকে হঠাৎ পুরো খুলে যায়।

যখন স্বরতন্ত্রী দুটি পরস্পরের থেকে সবচেয়ে বেশি দূরত্বে থাকার ফলে স্বরপথের পরিমাণ বেশি থাকে তখন শ্বাসবায়ু সেই স্বরপথ দিয়ে বিনা বাধায়, স্বরতন্ত্রীতে কোনো কম্পন না তুলে যাতায়াত করে। স্বরতন্ত্রীর এই রকম অবস্থানে আমরা যে সকল ধ্বনি উচ্চারণ করি তাদের বলে অঘোষ ধ্বনি। যেমন বাংলার ক্, খ্, চ্, ছ্, স্, শ্ ইত্যাদি।

কিন্তু যখন স্বরতন্ত্রী দুটি পরস্পরের খুব কাছাকাছি এসে পরস্পরের সঙ্গে প্রায় ঠেকে যায় তখন তাদের মাঝখান দিয়ে যাতায়াত করার সময় শ্বাসবায়ু তন্ত্রী দুটিকে বার বার ঠেলে পথ প্রশস্ত করে নিতে চায়। ফলে তন্ত্রী দুটি কাঁপতে থাকে ও এই কম্পনের ফলে একটি সুর সৃষ্টি হয়, স্বরতন্ত্রীর এই কম্পন বা সুরকে বলে ঘোষ। এই ঘোষ সহযোগে যে সব ধ্বনি উচ্চারিত হয় তাদের বলে ঘোষ ধ্বনি—যেমন বাংলার স্বরধ্বনি, গ্, ঘ্, দ্, ধ্, ন্, ব্, ভ্, ম্, ল্ ইত্যাদি।

অর্থাৎ—

(ক) স্বরতন্ত্রীর কম্পন = ঘোষ

(খ) ঘোষ যুক্ত ধ্বনি = ঘোষ ধ্বনি

(গ) ঘোষ বিযুক্ত ধ্বনি = অঘোষ ধ্বনি।

● অধিজিহ্বা

মুখগহ্বর থেকে শ্বাসনালি শুরুর মুখে, স্বরকক্ষের ওপরে, অধিজিহ্বার অবস্থান। এই অধিজিহ্বার কাজ খাদ্য ও পানীয়ের কণা থেকে শ্বাসনালিকে বাঁচানো।

● আলজিভ ও নরমতালু

আধজিহ্বার ওপরে আধজিহ্বার বিপরীত দিকে থাকে আলজিভ। আলজিভকে মাঝখানে রেখে শ্বাস ও খাদ্যনালির ওপরের অংশ মুখগহ্বর ও নাসিকাগহ্বর এই দুই গহ্বরে ভাগ হয়ে গেছে। মুখগহ্বর শেষ হয়েছে ঠোঁটে ও নাসিকাগহ্বর নাসারন্ধ্রে। আলজিভ থেকে শুরু করে সামনের দিকে ওপরের ঠোঁট ও দাঁত পর্যন্ত অংশ—যা নাসিকাগহ্বর ও মুখগহ্বরের মধ্যে পার্টিশানের কাজ করছে—এই অংশটি নিশ্ছিদ্র ভরাট। এই অংশের সামনের দিকে ওপরে ঠোঁট ও পিছনের দিকে নরম তালু সংলগ্ন আলজিভ নাড়ানো যায়।

এই নরম তালু ও আলজিভ ছবিতে দেখানো অবস্থান থাকলে এবং মুখগহ্বর উন্মুক্ত থাকলে ধ্বনি উৎপন্নকারী শ্বাসবায়ু নাক ও মুখ উভয় দিক দিয়েই নির্গত হয়। এইভাবে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয় তার নাম অনুনাসিক ধ্বনি—যেমন, আঁ, ইঁ, এঁ, ওঁ, উঁ, অঁ ইত্যাদি।

যদি নরমতালু ও আলজিভের অবস্থান ছবির মতোই থাকে, কিন্তু মুখগহ্বরে কোথাও কোনো বাধা থাকার ফলে শ্বাসবায়ু মুখগহ্বর দিয়ে না বেরিয়ে শুধুই নাসিকা গহ্বর দিয়ে বেরোয় তাহলে সেই ধ্বনিকে বলে নাসিক্য ধ্বনি—যেমন, বাংলা, ন্, ম্ ইত্যাদি।

● **ফুসফুস**

আমরা কথা বলার সময় যে ধ্বনি ব্যবহার করি সে ধ্বনি উৎপাদনের কাঁচামাল হল ফুসফুস থেকে বেরিয়ে আসা হাওয়া। ফুসফুস দুটো সংকুচিত হয়ে যে হাওয়া নিশ্বাসের আকারে নাক-মুখ দিয়ে বের করে দেয় তাই দিয়েই তৈরি হয় মুখের কথা—সোজা কথায় তাই হল আমাদের কথার দম। ধ্বনিবিজ্ঞানের ভাষায় **ফুসফুসজাত বহির্গামী হাওয়া**। এইখানে মনে রাখা দরকার যে ফুসফুসজাত অন্তর্গামী হাওয়া (অর্থাৎ প্রশ্বাস) দিয়েও কিছু কিছু আওয়াজ সৃষ্টি করা যায় কিন্তু সেই আওয়াজ বা ধ্বনি কথা বলার কাজে লাগে না।

● **স্বরতন্ত্রী**

আমাদের শ্বাসনালি নীচের দিকে ফুসফুসের সঙ্গে ও ওপরের দিকে মুখগহ্বরের সঙ্গে যুক্ত। এই শ্বাসনালির মধ্যে ওপরের দিকে একটি **স্বরযন্ত্র বা স্বরকক্ষ আছে**। আমরা গলার বাইরের দিকে হাত চেপে যদি ঢোঁক গিলি তাহলে এই স্বরকক্ষের ওঠানামা হাতে অনুভব করতে পারি। সাধারণত প্রাপ্তবয়স্ক বিশেষত পুরুষদের ক্ষেত্রে এই স্বরকক্ষ গলার বাইরে থেকে একটু উঁচু অংশ হিসেবে চোখে দেখাও যায়।

এই স্বরকক্ষের চারপাশ নরম মাংসপেশির নানা গ্রন্থি দিয়ে তৈরি। স্বরকক্ষের মধ্যে দুটি পাতলা নমনীয় পর্দা বা দুটি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি পাশাপাশি আনুমানিক শোয়ানো অবস্থায় থাকে। এদের বলে **কণ্ঠতন্ত্রী বা স্বরতন্ত্রী**। এই স্বরতন্ত্রী দুটি সামনে গলার দিকে পরস্পরের সঙ্গে জোড়া কিন্তু পিছনে ঘাড়ের দিকে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন। এই স্বরতন্ত্রী দুটি দুপাশে সরে গিয়ে মাঝখান দিয়ে বাতাস যাতাযাতের যে পথ করে দেয় সেই পথের নাম স্বরপথ।

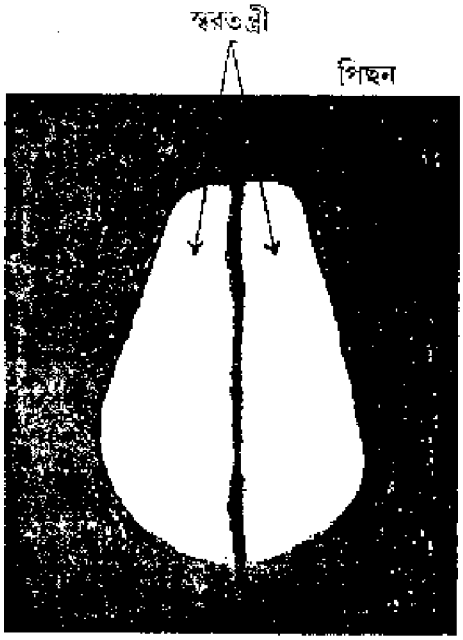

ঘোষধ্বনি উচ্চারণে
স্বরতন্ত্রীর অবস্থান

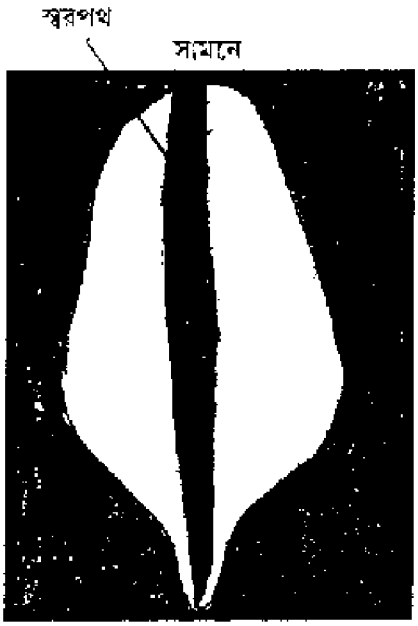

অঘোষধ্বনি উচ্চারণে
স্বরতন্ত্রীর অবস্থান

৪.৩ ধ্বনির উৎপত্তি

ধ্বনির সমন্বয়ে তৈরি হয় মুখের কথা। এই ধ্বনি তৈরি হয় কীভাবে ? ধ্বনি তৈরি হয় বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে।

প্রতিটি মানুষের শরীরে বাগ্‌যন্ত্র তার নাক ও ঠোঁট থেকে শুরু করে শরীরের অভ্যন্তরে ফুসফুস পর্যন্ত বিস্তৃত। মোটামুটি নাসা ছিদ্র, নাসিকা গহ্বর, ঠোঁট, মুখগহ্বরের দাঁত, জিভ, তালু ইত্যাদি, গলায় শ্বাসনালি, স্বরতন্ত্রী ও ফুসফুস নিয়ে তৈরি এই বাগ্‌যন্ত্র। জরুরি কথা এই যে বাগ্‌যন্ত্রের মুখ্য কাজ কিন্তু কথা বলা নয় ; মুখ্য কাজ হল শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালানো এবং খাওয়া-বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় দুটি মৌলিক কাজ। কথা বলার কাজটা হল এই দুটো বোঝার ওপরে শাকের আঁটির মতো একটা বাড়তি কাজ।

এবারে আসুন একটা ছবির সাহায্যে বাগ্‌যন্ত্রের পরিচয় বুঝতে চেষ্টা করি।

৪.৩.১ বাগ্‌যন্ত্র

আমাদের মাথাকে মাঝখান দিয়ে, দুটো চোখ ও দুটো কান দুপাশে রেখে, নাকটাকে সমান দুটো ভাগ করে লম্বালম্বি চিরলে যে দুটি ভাগ পাওয়া যায় তা বাগযন্ত্রে এক-একটা অংশ ভাগ কথা বলার কাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিযুক্ত বাগ্‌যন্ত্রের প্রতিটি অংশের সংস্থান ও নাম দেওয়া হয়েছে।

আলোচনার সুবিধের জন্য এই বাগ্‌যন্ত্রকে কয়েকটি প্রধান অংশে ভাগ করে সংক্ষেপে তাদের কাজ বোঝাতে চেষ্টা করি

বাগ্‌যন্ত্র

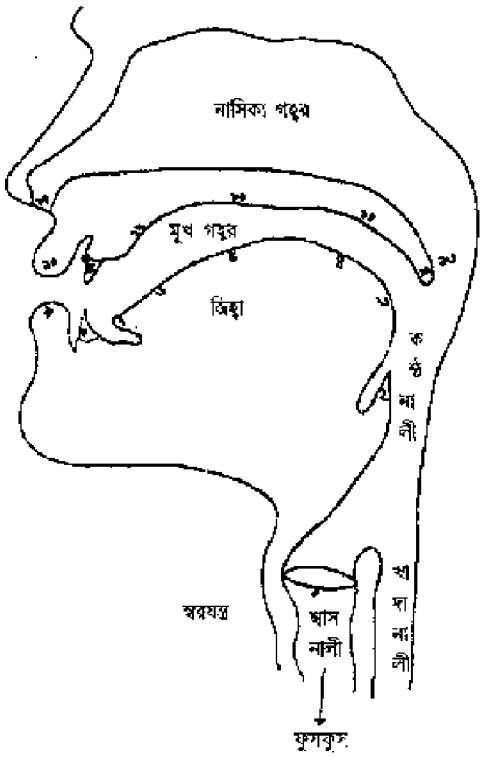

১. স্বরতন্ত্রী
২. অধিজিহ্বা
৩. জিভের গোড়া
৪. পশ্চাৎ জিহ্বা
৫. সম্মুখ জিহ্বা
৬. অগ্র জিহ্বা
৭. জিভের ডগ
৮. নীচের দাঁত
৯. নীচের ঠোঁট
১০. ওপরের ঠোঁট
১১. ওপরের দাঁত
১২. দন্তমূল
১৩. শক্ত তালু
১৪. নরম তালু
১৫. আলজিভ
১৬. নাসিকা গহ্বরের প্রবেশপথ
১৭. নাসারন্ধ্র

- বাংলা বিভাজ্য ও অবিভাজ্য ধ্বনি সম্বন্ধে জানতে পারবেন।
- আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা/IPA সংকেত ও সেই সংকেতে বাংলা উচ্চারণের লিপ্যন্তর পদ্ধতি সম্বন্ধে জানতে পারবেন।

৪.২ প্রস্তাবনা

মুখের ভাষায় বা মুখের কথায় ক্ষুদ্রতম একক ধ্বনি। বক্তা বিভিন্ন ধ্বনি পরপর সাজিয়ে অবিচ্ছিন্ন ধারায় উচ্চারণ করে কথা বলে—সেই কথা হওয়ায় ভেসে শ্রোতার কাছে পৌঁছয়—শ্রোতা তা শ্রবণ করে। কথা বলার সময় কোনো ধ্বনি এককভাবে উচ্চারিত হয় না বা কথার মধ্যে প্রতিটি ধ্বনিকে আলাদা আলাদা ভাবে শোনাও যায় না। কিন্তু তবুও আলোচনার খারিতে আমরা প্রতিটি ধ্বনিকে আলাদা আলাদা করে বিশ্লেষণ করি অর্থাৎ বাস্তব অবস্থার উল্টোদিকে যাই।

ধ্বনির গাঠনিক চরিত্র বিশ্লেষণ করে ধ্বনিবিজ্ঞান বা Phonetics। প্রধানত তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে ধ্বনিবিজ্ঞান ধ্বনি বিশ্লেষণ করে ঃ

১) বক্তা কীভাবে তার বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে ধ্বনি উচ্চারণ করে।

২) সেই ধ্বনি কীভাবে বাতাসে তরঙ্গ তুলে বক্তা থেকে শ্রোতার কাছে পৌঁছয়, ও

৩) শ্রোতা কীভাবে ধ্বনি শোনে।

এখানে প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ ধ্বনির উচ্চারণই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

এই তিন দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী ধ্বনিবিজ্ঞানের তিনটি শাখায় বিন্যস্ত, ধ্বনির উচ্চারণ বিশ্লেষণ করে উচ্চারণমূলক ধ্বনিবিজ্ঞান। ধ্বনিতরঙ্গের বিশ্লেষণ করে ধ্বনিতরঙ্গমূলক ধ্বনিবিজ্ঞান। এবং শ্রোতার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রোতার কান ও স্নায়ুতন্ত্রের ওপর বিভিন্ন বাগ্‌ধ্বনি ও ধ্বনিতরঙ্গের প্রভাব বিশ্লেষণ করে শ্রবণমূলক ধ্বনিবিজ্ঞান।

তিনটি শাখার মধ্যে সর্বাধিক আলোচিত ও উন্নত হল উচ্চারণমূলক ধ্বনিবিজ্ঞান। ধ্বনিতরঙ্গমূলক ধ্বনিবিজ্ঞান প্রধানত যন্ত্র ও পদার্থবিদ্যা নির্ভর এবং বর্তমানে বহু চর্চিত। আর শ্রবণমূলক ধ্বনিবিজ্ঞানের বিকাশ এখানো পর্যন্ত যথেষ্ট সীমিত।

আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞানের বিকাশ ঘটে প্রধানত উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথমভাগে, পশ্চিম ইউরোপে ও আমেরিকায়। তবে আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞানের মূলসূত্র কিন্তু নিহিত আছে প্রাচ্যের, বিশেষত ভারতের প্রাচীন ধ্বনিবিজ্ঞান চর্চার মধ্যে। ৫০০-১৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের ভারতীয় শাস্ত্রে ধ্বনিবিজ্ঞানের সবচেয়ে প্রাচীন ও বিস্তৃত আলোচনার সন্ধান পাওয়া যায়। তখন বৈদিক সূত্রাদির উচ্চারণ শুদ্ধি বজায় রাখবার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল প্রাতিশাখ্য, শিক্ষা ইত্যাদি ধ্বনিবিজ্ঞানমূলক শাস্ত্রাদি। এইসব শাস্ত্রে ঘোষীভবন প্রক্রিয়া, উচ্চারণ স্থান, নাসিক্য ধ্বনি, শব্দযতি ইত্যাদি ধারণার প্রয়োগ দেখা যায়।

এখানে আমরা উচ্চারণমূলক ধ্বনিবিজ্ঞানের ভিত্তিতে বাংলা ধ্বনিগুলির উচ্চারণ সম্বন্ধে আলোচনা করব।

এখানে একটু উল্লেখ রাখি যে কোনো নির্দিষ্ট ভাষার ধ্বনিগুলি, তাদের গাঠনিক চরিত্র ছাড়াও, তাদের ব্যাবহারিক চরিত্রের ভিত্তিতেও বিশ্লেষণ করা যায়। আমরাও পরবর্তী ধ্বনিতত্ত্ব এককে (পর্যায় ২, একক ৩ দ্রষ্টব্য) এই ব্যাবহারিক চরিত্রের আলোচনা করব।

একক ৪ ❐ ধ্বনিবিজ্ঞান

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ প্রস্তাবনা

৪.৩ ধ্বনির উৎপত্তি

৪.৩.১ বাগ্‌যন্ত্র

৪.৪ স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি

৪.৪.১ ব্যঞ্জনধ্বনি

৪.৪.২ বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিবিভাগ

৪.৪.৩ স্বরধ্বনি

৪.৪.৪ বাংলা স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ

৪.৫ ধ্বনি পরিবর্তন

৪.৬ বিভাজ্য ও অবিভাজ্য ধ্বনি

৪.৬.১ সুর/স্বর/স্বরাঘাত/সুরাঘাত

৪.৬.২ শ্বাসাঘাত/ঝোঁক/বল/প্রস্বন

৪.৬.৩ যতি/সংযোগ/সন্ধান/সংহিতা

৪.৬.৪ দৈর্ঘ্য

৪.৭ আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা/International Phonetic Alphabet/IPA

৪.৮ সারাংশ

৪.৯ অনুশীলনী

৪.১০ গ্রন্থপঞ্জি

৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে—

- বাগ্‌ধ্বনি, সংক্ষেপে ধ্বনির উচ্চারণ পদ্ধতি সম্বন্ধে জানতে পারবেন।
- ব্যঞ্জনধ্বনি শ্রেণিবিভাগের মাপকাঠি ও বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির সংখ্যা ও শ্রেণিবিভাগ সম্বন্ধে জানতে পারবেন।
- স্বরধ্বনি শ্রেণিবিভাগের মাপকাঠি ও বাংলা স্বরধ্বনির সংখ্যা ও শ্রেণিবিভাগ সম্বন্ধে জানতে পারবেন।